# সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি: স্বরূপ ও প্রতিকার

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

**www.ti-bangladesh.org**


গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা

**মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার**

অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবেদন

# সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি: স্বরূপ ও প্রতিকার[1]

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
প্রগ্রেস টাওয়ার (৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম তলা)
বাড়ি # ১ সড়ক # ২৩, গুলশান -১, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

**প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৭**

[1] এই গবেষণা কাজটি টিআইবি'র ফেলোশিপ কার্যক্রমের আওতায় সম্পন্ন করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের **অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া আখতার**

## মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বাংলাদেশে দুর্নীতি রোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে একটি অংশগ্রহণমূলক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে আসছে। টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সুশীল সমাজ এবং জনগণের দৈনন্দিন জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাবমুক্ত। এ লক্ষ্যে টিআইবি তার বহুমুখী গবেষণা, এ্যাডভোকেসি এবং জন-সম্পৃক্তকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে একটি ব্যাপক দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় সচেষ্ট।

টিআইবি মনে করে দুর্নীতি রোধ করতে হলে দুর্নীতির ধরন, প্রকৃতি ও ব্যাপকতা সম্পর্কে জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। যার জন্য বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা অপরিহার্য। দুর্নীতি-বিষয়ক গবেষণা শুধুমাত্র টিআইবি'র নিজস্ব কর্মশক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এক্ষেত্রে নতুন ও ব্যতিক্রমী চিন্তা ভাবনা উৎসাহিত করার লক্ষে টিআইবি একটি ফেলোশিপ কার্যক্রম শুরু করেছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ে গবেষণার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক, গবেষক, আইনজীবী, সাংবাদিক এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মজীবীদের জন্য ফেলোশিপটি প্রযোজ্য যা উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে। এই ফেলোশিপের আওতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার **সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতিঃ স্বরূপ ও প্রতিকার** শীর্ষক এই গবেষণাটি সম্পাদন করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্জনের পিঠস্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে শিক্ষার্থীরা একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ চর্চার শিক্ষা গ্রহণ করে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা এক সময় বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করলেও নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সে সুনাম হারাতে বসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে পাঠ্যক্রম, প্রশাসনিক কার্যক্রম এমনকি সনদ প্রদান সকল ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হচ্ছে ব্যাপক অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কতিপয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ছাত্র এবং শিক্ষক নিজ স্বার্থে দায়িত্বের অপব্যবহার করছেন। এর ফলে এ দেশের সরকারি পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাই এখন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। বিষয়গুলো নিয়ে সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে সংবাদ প্রকাশিত হলেও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধানী গবেষণা পরিচালিত হয়নি। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার তার গবেষণার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দুর্নীতির একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় দু'টির একাডেমিক ক্ষেত্রর দুর্নীতি, শিক্ষক ও ছাত্রদের দলীয় রাজনীতির লেজুরবৃত্তির চর্চা, শিক্ষকদের পাঠদানে অনিয়ম ও দায়িত্বে অবহেলা, ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে অনুপস্থিতি, শিক্ষক নিয়োগে ও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি, পদোন্নতি ও অবসরের ক্ষেত্রে অনিয়ম, আবাসিক হলগুলোতে দুর্নীতি, পরিবহন ও অন্যান্য ব্যবস্থায় দুর্নীতিসহ সার্বিক দুর্নীতির একটি অনুসন্ধানী চিত্র ফুটে উঠেছে এ গবেষণায়। সে সাথে এসব দুর্নীতি প্রতিকারে করণীয় সম্পর্কেও অনেক সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এতে। গবেষণাটি নীতি-নির্ধারক, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীসহ আগ্রহী সকলের জন্য সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমরা আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত দুর্নীতির চিত্রটি অনুধাবন করবেন এবং সুপারিশগুলো বাস্ত বায়নে আন্তরিকভাবে তৎপর হবেন। এই প্রতিবেদন তথা টিআইবি'র কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা ও মতামত দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনকে আরো গতিশীল করবে।

**ইফতেখারুজ্জামান**
**নির্বাহী পরিচালক**

## সার-সংক্ষেপ

বর্তমান বিশ্বে দুর্নীতি একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাব আবির্ভূত হয়েছে। এ সমাজব্যধির আশংকাজণক বৃদ্ধি মোকাবেলা করতে বিভিন্ন দেশে প্রণীত হয়েছে নানা রকম দুর্নীতি-বিরোধী আইন এবং গড়ে উঠেছে দুর্নীতি-বিরোধী সংস্থা। হংকং এবং অষ্ট্রেলিয়া এদের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে গড়ে তুলেছে দুর্নীতি-বিরোধী সংস্থা Independent Commission Against Corruption (ICAC). বাংলাদেশে অনেক দেরীতে হলেও ২০০৪ সালে জাতীয় সংসদে দুর্নীতি দমন কমিশন বিল পাশ করে গড়ে তোলা হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। বিশ্বব্যাপী বর্ধিত দুর্নীতি পরিমাপ এবং দুর্নীতির হ্রাস-বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য গড়ে উঠেছে বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই), যে সংগঠণটি ফি-বছর দুর্নীতির ধারনা সূচক (Corruption Perception Index) প্রকাশ করে অধিক দুর্নীতি কবলিত দেশগুলোকে সতর্ক সংকেত দিচ্ছে, যদিও এদের এ কর্মকান্ডকে ঘিরে বুদ্ধিজীবী মহল ও সুশীল সমাজ সদস্যদের মধ্যে কিছু কৌতুহল ও বিতর্ক রয়েছে।

দুর্নীতিকারীরাও নানা কৌশলে তাদের দুর্নীতি কর্ম চালিয়ে যাবার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। দুর্নীতি-বিরোধীদের চেয়ে দুর্নীতিকারীরা তাদের কর্মকান্ডে এগিয়ে রয়েছেন বলেই দুর্নীতি ক্রমবর্দ্ধমানভাবে বেড়ে চলেছে এবং একে আজ বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ সমস্যা হিসাবে স্বীকার করা হচ্ছে। দুর্নীতিকারীরা অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীনদের প্রশ্রয় পাচ্ছে এবং নানা কৌশলে রাজনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবিদেরকে তাদের কাজের সঙ্গে জড়িত করতে সমর্থ হচ্ছে।

দুর্নীতির সংগা বিষয়ক আলোচনায় জোসেফ এস নাঈ-এর সংগাটির অধিক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, যে সংগায় দুর্নীতিকে এমন ব্যবহার বলা হয়েছে যা ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে কোনো বিশেষ দায়িত্বে মনোনীত বা নির্বাচিত ব্যক্তিকে যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন থেকে বিচ্যুত করে। প্রচলিত দুর্নীতি সাহিত্যে গবেষকরা দুর্নীতিকে এমনভাবে সংগায়িত করেছেন যা প্রধানত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এলাকার দুর্নীতিকে তুলে ধরে। যেহেতু দুর্নীতির বিস্তার শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক এলাকায় সীমাবদ্ধ নয়, সেজন্য দুর্নীতির সংগা এমনভাবে দেওয়া উচিত যাতে সকল এলাকার দুর্নীতিকেই ঐ সংগার সাহায্যে সনাক্ত করা যায়। পাশ্চাত্যের এক শ্রেণীর দুর্নীতি গবেষক দুর্নীতিকে উন্নয়ন-সহায়ক হিসাবে যে ব্যাখ্যা করেন তা বর্তমান প্রজন্মের দুর্নীতি গবেষকরা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বেশি দুর্নীতি কবলিত দেশগুলোতে দুর্নীতি বিষয়ক গবেষণা কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয়েছে। বাংলাদেশ এ রকম দেশের তালিকাভুক্ত। এসব দেশে সাংবাদিক এবং গণমাধ্যম দুর্নীতির নমূণা উপস্থাপন করলেও দেখা যায় যে সেসব উপস্থাপনার তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং বিশ্লেষণ থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূর্বল। তবে এসব দেশে দুর্নীতির আশংকাজণক বৃদ্ধি উন্নয়নকে হুমকিযুক্ত করায় গবেষকদের মাঝে দুর্নীতি বিষয়ে কাজ করার একটা প্রবণতা প্রত্যাশিত মাত্রায় না হলেও ক্রমান্বয়ে জণপ্রিয়তা পাচ্ছে।

দুর্নীতি সাহিত্যের সতর্ক জরিপ দুর্নীতি প্রাসঙ্গিক প্রকাশিত কাজগুলোর অধিকাংশেরই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতিকেন্দ্রিকতা তুলে ধরে। প্রকাশিত দুর্নীতি সাহিত্যে সামাজিক দুর্নীতি বিষয়ে গবেষণার উল্লেখযোগ্য অভাব রয়েছে। শিক্ষাঙ্গণের দুর্নীতিও উন্মোচন করা হয়নি যদিও অনেক উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষাঙ্গণে দুর্নীতির ব্যাপক চর্চা হচ্ছে। বাংলাদেশে শিক্ষাঙ্গণে দুর্নীতি চর্চিত হলেও এ দুর্নীতি উন্মোচনে গবেষকদেরকে মনোযোগী মনে হয় না। এ দেশে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়েও দুর্নীতি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, প্রশাসনিক এবং আর্থিক অঙ্গণ থেকে শুরু করে দুর্নীতি প্রায় প্রতিটি দৈনন্দিন কাজে সংক্রামিত হয়েছে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অঙ্গণের দুর্নীতি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মৌলিক ধারণা থাকলেও শিক্ষাঙ্গণের দুর্নীতি সম্বন্ধে তাদের ধারণা অস্পষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানে সুশাসন বিঘ্নিত হওয়ায় আগামী প্রজন্ম কর্মজীবনে প্রবেশ করার প্রাক্কালে ছাত্রজীবনে সুশাসন, শৃংখলা, প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার পরিবর্তে পরিচিত হচ্ছেন অনিয়ম, বিশৃংখলা এবং দুর্নীতি চর্চার সঙ্গে। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি উন্মোচন করে একে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন নিশ্চিত করা দরকার।

দুর্নীতি বাংলাদেশে সব সময় ছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশে দুর্নীতি পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার পরিবর্তে দেখা গেছে সনাতনী মূল্যবোধের লালন এবং জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থে মনোযোগী হতে। সে কারণে মুজিব শাসনামলে স্বজণপ্রীতি ও রিলিফ দুর্নীতি ব্যাপক রুপ নিয়েছিল। পরবর্তীতে জিয়া ও এরশাদ শাসনামলেও দুনীতি পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। প্রেসিডেন্ট জিয়ার ব্যক্তিগত সততা থাকলেও তিনি দলে দুর্নীতিবাজদেরকে ঠাঁই দিয়েছেন এবং প্রেসিডেন্ট এরশাদ দুর্নীতির বিরুদ্ধে উচ্চকন্ঠ হলেও দুর্নীতিকারীদেরকে শাস্তি দেবার পরিবর্তে তাদেরকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছেন।

বাংলাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ও নিয়ম-কানুনের অনুসরণের পরিবর্তে চর্চিত হচ্ছে অনিয়ম ও দুর্নীতি। বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে এসব বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে পদে পদে এ অধ্যাদেশ লংঘিত হচ্ছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে অধিক মনোযোগ কাম্য। কারণ, আগামী দিনের প্রশাসক ও দেশ পরিচালকরা যদি বিশ্ববিদ্যালয়েই শৃংখলা ও সুশাসনের সঙ্গে পরিচিত না হন তাহলে কর্মজীবনে গিয়ে তারা দুর্নীতিপরায়ন হয়ে পড়বেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম-শৃংখলা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে পারলে সারা দেশে দুর্নীতি পরিস্থিতির ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় একটি একাডেমিক প্রতিষ্ঠাণ এবং এর প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞাণ-বিজ্ঞান চর্চা ও অনুশীলণ হলেও বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সে মহান উদ্দেশ্য অর্জণে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে

যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অনেক প্রার্থী রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জণে সমর্থ হচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে দুর্নীতির ফলে এসব উচ্চতর ডিগ্রীর গুণগত মান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনে স্বচ্ছতা নেই। ছাত্রছাত্রীদেরকে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় পাশ করা পর্যন্ত বিভিন্ন রকম অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় একরূপত্ব নেই। ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা, ফরম বিক্রির অর্থ খরচ, ভর্তি সংক্রান্ত কাজের সম্মানী প্রদান, প্রভৃতি ক্ষেত্রে নানা রকম ত্রুটী-বিচ্যুতি ও অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়। ভর্তি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ না করলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, মাননীয় উপ-উপাচার্য এবং হিসাব নিয়ামককে উচ্চ হারে সম্মানী দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি পরীক্ষায় শিক্ষক, কর্মকর্তাদের পরিদর্শন এবং কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনের সম্মানীও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকম।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভাগীয় প্রশাসনে রয়েছে বিভিন্ন দূর্বলতা। বিভাগীয় প্রশাসনে অনিয়ম, বিশৃংখলা, দায়িত্বে অবহেলা, পক্ষপাতিত্ব, প্রভৃতি চর্চিত হওয়ায় সুষ্ঠুভাবে বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে না। বিভাগীয় সভাপতির হাতে উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা না থাকায় তিনি একজন ভদ্র সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেন। অবশ্য সভাপতির হাতে বেশি ক্ষমতা দিলে তার রাজনৈতিক অপব্যবহার হবার সম্ভাবনা থাকে। শিক্ষকদের অনেকে বর্ণ রাজনীতিতে জড়িত হওয়ায় বিভাগীয় কমিটিসমূহের সিদ্ধান্তে অনেকক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব পড়ে। বিভাগের ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকদের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার সুব্যবস্থা নেই। শিক্ষকরা অকারণে ক্লাস না নিলে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা কোনো অভিযোগ করেন না।

জমা দেবার কথা বলে গ্রহণ করে নিজেরাই আত্মসাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চতর ডিগ্রী করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অনিয়ম ও দুর্নীতি হচ্ছে। অনেক ছাত্র ডিগ্রী করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ না করে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ডিগ্রী করতে সক্ষম হচ্ছেন। যেসব শিক্ষক বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রী করতে যেয়ে ডিগ্রী করে বা না করে দেশে ফিরে আসেননি, এমন শিক্ষকদের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটি কোটি টাকা পাওণা থাকলেও রাজনৈতিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয় এ অর্থ আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে না। দেশে ডিগ্রী করতে যেয়ে ব্যর্থ হওয়া শিক্ষকদের নিকট থেকেও বিশ্ববিদ্যালয় এর আর্থিক পাওনা একই কারণে আদায়ে ব্যর্থ হচ্ছে। কনসালট্যান্ট শিক্ষকদের আয়ের ১০% আদায়েও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একই কারণে ব্যর্থ হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ আত্মসাৎকারী কনসালট্যান্ট শিক্ষকরা প্রায়শ:ই বড় বড় সম্মেলন বা সেমিনারে সুশাসনের ওপরে প্রবন্ধ পড়ছেন।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক চরিত্র ম্লান হয়ে এর রাজনৈতিক চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যদিও ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের ৮২% বিশ্ববিদ্যালয়কে একাডেমিক প্রতিষ্ঠান মনে করেন। বেশির ভাগ ছাত্র-শিক্ষক-অভিবকরাই (৭৪%) বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক চরিত্র নষ্ট হবার পেছনে ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতিকে দায়ী করেন এবং তাদের অধিকাংশের (৫৯%) মতে দলীয় লেজুড়বৃত্তিভিত্তিক ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করে দিলে ভাল হয়। তারা এও মনে করেন যে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত হলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের ৭৩% স্বীকার করেন যে কিছু ছাত্র নেতা চাঁদাবাজিতে জড়িত আছেন এবং তাদের অধিকাংশ (৬২%) স্বীকার করেন যে ঠিকাদারদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রনেতাদেরকে চাঁদা না দিয়ে নির্মাণ কাজ করা সম্ভব নয়। দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় শিক্ষকগণ সমমনা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন বলে মনে করেন ৬৯% ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক যে কারণে তাদের ৯১% প্রচলিত ধারার ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি থাকা উচিত নয় বলে মত দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি বাড়ছে এমন ধারনা পোষণ করেন বেশির ভাগ ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক (৮৩%) এবং এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে ক্রমান্বয়ে বকশিশ